আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন ইসলামী রাষ্ট্র

ডঃ খুরশীদ আহমদ

আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন ইসলামী রাষ্ট্র

আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন ইসলামী রাষ্ট্র

ডঃ খুরশীদ আহমদ
অনুবাদঃ আবদুস শহীদ নাসিম

দু'টি কথা

এই নিবন্ধটি লেখক আলাদা পুস্তিকাকারে লেখেননি। আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে প্রফেসর খুরশীদ আহমদ যখন মাওলানা মওদুদীর (রঃ) ইসলামী রাষ্ট্র সংক্রান্ত লেখাগুলো "ইসলামী রিয়াসাত" নামে সংকলন করেন, তখন তিনি গ্রন্থটির একটি দীর্ঘ ভূমিকা লেখেন। এ হচ্ছে সেই ভূমিকা। গুরুত্ব বিচারে তা আলাদা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হলো।

পুস্তিকাটি পড়ে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের চোখ খুলে যাবে বলে আশা করি।

আবদুস শহীদ নাসিম
১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

সূচী পত্র

১। রাষ্ট্র এবং ইসলাম ৫

২। আধুনিক কালে ইসলামী রাষ্ট্র ১১

৩। ইসলামী বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সংগ্রাম ১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আধুনিক বিশ্বের প্রয়োজন ইসলামী রাষ্ট্র

মানুষ তার সামাজিক জীবনের শৃংখলা ও উন্নয়ন সাধনের জন্যে যেসব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে তন্মধ্যে রাষ্ট্র সংস্থা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক। রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক কাঠামো যার মাধ্যমে কোনো ভূখন্ডের অধিবাসীরা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে নিজেদের সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করে।

সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই মানুষ এ সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বস্তুত গোটা মানব ইতিহাসই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল ও শক্তিশালী করা, এর ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, শৃংখলা রক্ষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন এবং এর প্রসার ও উন্নতি সাধন করার ইতিহাস।

আধুনিককালে প্রযুক্তিও কর্মকৌশলের উন্নতি সাধন এবং সামাজিক জীবনে নিত্যনতুন চিন্তা ভাবনার পথ পেয়ে যাবার ফলে রাষ্ট্রের কার্য পরিধি দিন দিন বেড়েই চলেছে। এখন বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রের কাজ কেবল শান্তি শৃংখলা এবং আইন ও নিরাপত্তা রক্ষাই নয়, বরঞ্চ সামষ্টিক ইনসাফ এবং সামাজিক সাফল্য অর্জনও বটে। বর্তমানে রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠিত ভূমিকা (Role) পালন করছে। এখন সে জীবনের প্রায় প্রতিটি বিভাগকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে।

১. রাষ্ট্র এবং ইসলাম

ইসলাম তার গোটা ইতিহাসে কখনো রাষ্ট্রের গুরুত্বকে উপেক্ষা করেনি। আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম তাঁদের স্ব স্ব সময়কালের সামাজিক ও সামষ্টিক শক্তিকে ইসলামের অনুগত ও অনুসারী বানাবার চেষ্টা সংগ্রাম করেছেন। তাঁদের গোটা দাওয়াতী মিশনের কেন্দ্র বিন্দু এই ধারনার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এবং শিরক তা গোপন ও প্রকাশ্য যে রূপেই বর্তমান থাকুকনা কেন তাকে খতম করে দেয়া হবে। তাঁদের প্রত্যেকের এই একই আহবান ছিলঃ

يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ (الاعراف ٥٩)

"হে আমার জাতির লোকেরা তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ্ নেই।" ১ (আরাফ ৬৫)

আর তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁদের স্ব-স্ব জাতির নিকট এই দাবী করেছিলেনঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنَ ـ (الشعراء/١٦٣)

"তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর আমার আনুগত্য করো।" (আশ শুয়ারা-১৬৩)

আল্লাহর এই প্রেরিত বান্দারা মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগকে পরিশুদ্ধ করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা সংগ্রাম করেছেন, যাতে করে আল্লাহ্র যমীনে তার দীন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর আইন ও বিধান চালু ও কার্যকর হয়। তাদের এই প্রাণান্তকর চেষ্টা সংগ্রাম ছিল পূর্নাংগ জীবনের সংশোধনের জন্যে। আর রাষ্ট্রের সংশোধন ছিল সেই সংশোধনেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কুরআন অধ্যয়ন থেকে জানা যায়, হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ) হযরত সুলাইমান (আঃ) এবং মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তা আদর্শিক মানে পরিচালনা করেছিলেন। ওল্ড এবং নিউ টেষ্টামেন্টের অধ্যয়ন থেকে এই সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, বনী ইসরাইলের অন্যান্য নবীগণও রাষ্ট্র সংস্থার সংশোধনের চেষ্টা করেছেন এবং ভ্রান্ত নেতৃত্বের অবাধ সমালোচনা করেছেন। ইসলামী চিন্তা ধারায় রাষ্ট্র যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা এই বিষয়টি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, স্বয়ং আসমান ও যমীনের স্রষ্টাই তাঁর নবী (সাঃ) কে এরূপ দোয়া করতে শিখিয়ে দেনঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ
صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا (بنى اسرائيل ٨٠)

"আর তুমি দোয়া করোঃ হে প্রভু, আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে সত্যতা সহকারে নিয়ে যাও আর যেখান থেকেই বের করবে সত্যতা সহকারে বের করো, আর তোমার নিকট থেকে একটি সার্বভৌম শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।" (বনী ইসরাইল-৮০)

---

১. ইলাহ (اله), রব (رب), ইবাদত (عبادت), দ্বীন (دين),

এই মৌলিক পরিভাষাগুলোর সঠিক তাৎপর্য অনুধাবনের জন্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য প্রকাশক-আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা)

আয়াতটি হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক পটভূমি দ্বারা দোয়াটির গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এথেকে রাষ্ট্র সংস্থার অপরিসীম গুরুত্ব পুরোপুরি অনুধাবন করা যায়। মাওলানা মওদূদীর ভাষায় আয়াতটির গুরুত্ব এরূপঃ

"প্রভূ) হয় আমাকেই রাষ্ট্রক্ষমতা দান করো, আর না হয় অপর কোনো রাষ্ট্রকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। যেনো আমি তার শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে পৃথিবীর এই মহাভাংগন ও বিপর্যয়কে সংশোধন করতে পারি, অশ্লীলতা ও নাফরমানীর এই মহাপ্লাবনকে প্রতিরোধ করতে পারি এবং তোমার সুষম আইন ও বিধানকে চালু ও কার্যকর করতে পারি। হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদাহ্ (রঃ) আয়াতটির এই তফসীরই করেছেন। ইবনে কাসীর এবং ইবনে জরীরের মতো শ্রেষ্ঠ মুফাস্সিরগণও এই মতই গ্রহন করেছেন। হাদীস থেকেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَالَا يَزَعُ بِالْقُرْاٰنِ -

"আল্লাহ্ তা'আলা রাষ্ট্র ক্ষমতা দ্বারা সেসব জিনিসই বন্ধ করে দেন যা শুধুমাত্র কুরআন দ্বারা বন্ধ করা যায়না।"

এথেকে জানা গেল, ইসলাম পৃথিবীতে যে সংশোধন ও সংস্কার চায় তা শুধুমাত্র ওয়ায নসীহত দ্বারা সম্ভব নয়, বরঞ্চ তা কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা অপরিহার্য। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই যখন তাঁর নবীকে (সাঃ) এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, তখন তা থেকে এ জিনিসটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, দীন প্রতিষ্ঠা করা, শরীয়াহ্ কার্যকর এবং আল্লাহ্র 'হুদসমূহকে' জারি করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা চাওয়া এবং তা লাভ করার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম চালানো শুধু কেবল বৈধই নয়, বরঞ্চ তা একান্ত কাম্য ও বাঞ্চনীয়। যারা একাজকে দুনিয়াদারীর কাজ বলে ব্যাখ্যা করেন তারা সাংঘাতিক ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছেন। কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জন্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চায় তবে সেটা দুনিয়াদারীর কাজ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর দীন কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা পেতে চাওয়া দুনিয়াপুরস্তি নয়, বরঞ্চ খোদা পুরস্তিরই অনিবার্য দাবী।"(১)

নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

১. তাফহীমুল কুরআন সূরা বনী ইসরাইল টীকা-১০০।

وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ
بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ - (الحديد/٢٥)

"আমরা আমাদের রাসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। সে সাথে কিতাব এবং মীযান (ইনসাফ) ও দিয়েছি, যেনো লোকেরা ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাছাড়া আমরা লোহা (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা) ও অবতীর্ন করেছি। যাতে রয়েছে দোরদন্ড শক্তি এবং মানুষের জন্যে বিপুল কল্যাণ।" (আল হাদীদ-২৫)

هُوَالَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ - (الصف)

"তিনিই (আল্লাহ তা'আলা) তো সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেনো সে তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করে দেয়। তা মুশরিকদের জন্যে সহ্য করা যতোই কঠিন হোকনা কেন।" (আসসফ-৯)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ
الْكَافِرُوْنَ - (المائدة/٤٤)

"আর যারা আল্লাহর অবতীর্ন আইন অনুযায়ী ফয়সালা করেনা তারা কাফির।" (আল মায়িদা-৪৪)

নবী আকরাম (সাঃ) বলেছেনঃ

الاسلام والسلطان اخوان توأمان لا يصلح واحد
منهما الا بصاحبه، فالاسلام اسّ والسلطان حارس
وما لا اس له يهدم وما لا حارس له ضائع (كنز العمال)

"ইসলাম এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দুই সহোদর ভাই। তাদের একজন অপরজনকে ছাড়া সংশোধন হতে পারেনা। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, ইসলাম হচ্ছে কোনো অট্টালিকার ভিত আর রাষ্ট্র ক্ষমতা হচ্ছে তার পাহারদার। যে অট্টালিকার ভিত নেই তা যেমন পড়ে যেতে বাধ্য, তেমনি যার পাহারাদার ও রক্ষক নেই তাও ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য।" (কান্‌যুল উম্মাল)

মুসলমানরা সব সময় নিজেদের রাষ্ট্রকে ইসলামের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে আসছে, ফলে ইসলামী দর্শনে ধর্ম ও রাজনীতি দুটি আলাদা জিনিস হবার কোনো ধারনা নেই। এই চেষ্টা সংগ্রাম তাদের দীন ও ঈমানেরই দাবী। তারা কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে যেমন উত্তম চরিত্র এবং সদাচারের শিক্ষালাভ করে, তেমনি সমাজ, সভ্যতা, অর্থনীতি এবং রাজনীতির বিধানও তা থেকেই গ্রহন করে। এই শেষোক্ত অংশের উপর আমল করার জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র অপরিহার্য। এই অংশের উপর আমল করা না হলে শরীয়তের একটি অংশ বাদ পড়ে যায় এবং কুরআন চিত্রিত সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবে রূপলাভ করেনা। একারণেই উম্মতের ফকীহগণ সর্বসম্মতি ক্রমে ইমাম নির্বাচিত করাকে ফরয বলে ঘোষনা করেছেন। এ ব্যাপারে অসতর্কতা প্রদর্শনকে তারা একটি দীনি বিধান বাস্তবায়নে অসতর্কতা বলে গন্য করেছেন। আল্লামা ইবনে হাযম তার "আল ফাসলু বাইনাল মিলাল ওয়ান নাহল " গ্রন্থে লিখেছেনঃ

اتفق جميع اهل السنة وجميع المرجيئة وجميع الشيعة
وجميع الخوارج على وجوب الامامة - وان الامامة واجب
عليها الانقياد لامام عادل ليقيم احكام الله ويسوسهم
باحكام الشريعة التى اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

"গোটা আহলে সুন্নাত, মারজিয়া, শীয়া এবং খারেজীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কাউকে ইমাম নির্বাচন করা ওয়াজিব এবং উম্মতের উপর এরূপ ন্যায়পরায়ন ইমামের আনুগত্য করা ফরয, যিনি আল্লাহ তা'আলার বিধান কায়েম করবেন এবং সেই শরীয়তের বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন, যা নিয়ে এসেছিলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)।"[১]

শাহ্ অলি উল্লাহ্ দেহলবী (রঃ) লিখেছেন:

"দীনি দৃষ্টিতে পূর্ণযোগ্যতা সম্পন্ন খলীফা নিযুক্ত করা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিবে কিফায়া। এ হুকুম তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।"[২]

এ এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে গোটা উম্মাহ্র ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) বাস্তবে নেতৃত্বকে কতটা গুরুত্ব দিতেন তা রাসূলে

১ الفصل بين الملل والنحل ঃ ইবনে হাযমঃ ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ৮৭।

২ শাহ্ অলি উল্লাহঃ ইযালাতুল খিফা ঃ ১ম অধ্যায়।

করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরবর্তী ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়। তাঁরা তাঁকে দাফন করার পূর্বেই ইমাম নির্বাচিত করেন, যিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ধরে রাখেন এবং পূর্ণ কেন্দ্রীয় মর্যাদার সাথে সকল কাজ সম্পাদন করেন। ইসলাম বস্তুগত ক্ষমতা করায়ত্ব করতে চায়। এ ছাড়া সে তার পূর্ণ মিশন সফল করতে পারেনা। এই নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কেবল ক্ষমতা হিসাবে লাভ করাটাই উদ্দেশ্য নয় বরঞ্চ দাওয়াতের পূর্ণতা এবং মানবতার সংশোধন কাজের মহান দায়িত্ব পালন করার জন্যে নেতৃত্ব অপরিহার্য মাধ্যম। তাই কুরআন এ দৃষ্টিভংগি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ইসলামের বস্তগত নেতৃত্ব তার আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের মাধ্যম এবং এরই ফলশ্রুতিতে সততার প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও দুষ্কৃতির উৎপাটন সম্ভবঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ (الحج/٤١)

"এই মুসলমানরাই সেই লোক, আমরা যদি পৃথিবীতে তাদের ক্ষমতা দান করি (অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি তাদের হুকুম চলতে থাকে) তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সততার নির্দেশ দেবে, অন্যায় অপকর্মে বাধা দেবে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম ফলতো আল্লাহ্‌র হাতেই" (সূরা হজ্জ ৪১)

এযাবত আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম তার সারমর্ম এই দাঁড়ায়ঃ

(১) রাষ্ট্র সংস্থা মানব সমাজের একটি বুনিয়াদী প্রয়োজন। রাষ্ট্র ছাড়া সুশৃংখল ও সুসংগঠিত সমাজ জীবন কল্পনা করা দুস্কর।

(২) ইসলাম পূর্নাংগ মানব জীবনের জন্যে হিদায়াত। সমাজ জীবন নির্বাহের সুস্পষ্ট পথনির্দেশ এতে রয়েছে।

(৩) ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য রাখেনা। সে পূর্নাংগ মানব জীবনকে খোদায়ী বিধানের অধীন করে দিতে চায়। এ উদ্দেশ্যে সে

(৪) আত্মার অভ্যন্তরীন পাশবিকতা কিংবা বাইরের কোনো চাপ কিংবা ভীতির কারণে আল্লাহ্‌র কিছু আইনকে মেনে নেয়া এবং কিছু আইনকে উপেক্ষা করার নীতি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্‌র শাস্তি লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাজনীতিকেও ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে ঢেলে সাজায় এবং রাষ্ট্রকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা এবং সুরক্ষিত করার কাজে ব্যবহার করে।

(৫) ধর্ম, রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে এতোটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে যে, রাষ্ট্র ও সরকার যদি অনৈসলামী হয় তবে তা হয় যুলুম ও বেইনসাফীর হাতিয়ার এবং তা দ্বারা সংঘটিত হয় চেংগিজী ধ্বংস লীলা। পক্ষান্তরে ইসলাম যদি হয় রাষ্ট্র ও সরকার বিহীন তবে বাদ পড়ে থাকে তার বিরাট একটা অংশ এবং বিজয়ী ও ক্ষমতাসীন হবার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র দীন হয় পরাজয় ও দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ। এজন্যেই রাষ্ট্রকে ইসলামের বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত করা, সরকারকে ইসলামের পুর্ন আনুগত্য ও অনুসরন করা এবং তা কার্যকর করার জন্য অবিরাম তৎপরতা চালানো জরুরী।

২. আধুনিক কালে ইসলামী রাষ্ট্র

এযাবত ইসলামী রাষ্ট্রের দীনি গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছি। কিন্তু আমরা যদি বর্তমান যুগের অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি, তাহলে একথা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া একালের সব চাইতে বড় প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য একটি বিশেষ পটভূমিতে ধর্মহীন রাষ্ট্রের ধারনা জন্ম দিয়েছে। সেখানে পোপতন্ত্র যে রূপ ধারন করেছিল এবং ধর্মের নামে রাজাদের সাথে যোগসাজসের মাধ্যমে যেসব যুলুম নির্যাতনকে বৈধ বলে সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছিল, সেগুলো এক বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। খৃষ্টবাদের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে এমন আক্রোশ সৃষ্টি হয় যে, তারা স্বয়ং ধর্মের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে বসে। আর এই বিদ্রোহের পরিণতিতেই আত্মপ্রকাশ করে ধর্মহীন রাষ্ট্র।

জ্যাকোব হোলেক যখন রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পবিত্র রাখার এই আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন, সে সময়ই ১৮৩২ সালে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রথম দিকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল দার্শনিক ও রাজনীতিবিদদের হাতে। এব্যবস্থাটি অতি অল্প সময়ে রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। সংক্ষেপে, এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ধর্মের পরিধি ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত সীমিত থাকতে হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাকে প্রবেশ করানো যাবেনা। প্রথম প্রথম ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পূর্ন ব্যক্তি স্বাধীনতা পর্যন্তই এর বক্তব্য সীমিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এই আন্দোলনের একটি অংশ ধর্মের বিরোধিতা এবং বর্বর বস্তুবাদ ও সমাজতন্ত্রের হোতা হয়ে দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্যে ধর্মহীন রাষ্ট্রের নিম্নোরূপ বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়ঃ

(১) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানুষের মধ্যে সংশয় এবং মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। মানুষের সামনে কোনো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বাকি রাখেনি। মানুষের মধ্যে এক প্রকার অবিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছে। এই মানসিক ও চৈন্তিক অস্থিরতার ফলশ্রুতিতেই সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মতো আন্দোলন জন্ম নেয় এবং মানুষকে বস্তুপূজার চরম সীমায় পৌঁছে দেয়। সমাজতন্ত্রের বিখ্যাত সমালোচক আর এন ক্রু হান্ট লিখেছেনঃ

"সামাজিক দূরাবস্থা এবং দারিদ্রের কারণে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কারণ নীচু দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের পরিবর্তে উচ্চ বেতনধারী শ্রমিক এবং শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের প্রতিই এর মূল আকর্ষণ। আর সমাজতন্ত্র এজন্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে, জনগণের মধ্যে এখন পুঁজিবাদী সমাজের অপকারিতা এবং অন্যায় ও বেইনসাফীর চেতনা সৃষ্টি হয়ে গেছে।

সত্য কথা হলো এবং সর্বশেষ অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এই কথাই বলে যে, সমাজতন্ত্র হচ্ছে সেইসব মতবাদ ও দৃষ্টিভংগির সমষ্টির নাম, যেগুলো আমাদের জীবনের সেই শূন্যতাকে পূর্ন করেছে যা পরিপাটি ধর্মীয় কাঠামোর ধ্বংসের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল এবং যা ছিল সমাজ জীবনে ধর্মহীনতার বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিনতি। এই দার্শনিক ব্যবস্থার (সমাজতন্ত্রের) যদি মোকাবেলা করতে হয় তবে তা কেবল এমন একটি বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা দ্বারাই করা যেতে পারে যা হবে এর চাইতে ভিন্নতর কোনো আদর্শের পতাকাবাহী।"[১]

আর যারা সমাজতন্ত্র গ্রহণ করেনি, তারা চরমভাবে আধ্যাত্মিক দুর্ভাবনা, চিন্তাগত অস্থিরতা এবং হতাশা ও বিশ্বাসহীনতার শিকার হয়েছে।

(২) এ ধর্মহীন রাষ্ট্র ব্যক্তির সামনে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা চরিতার্থ করা ছাড়া আর অন্য কোনো লক্ষ্য অবশিষ্ট রাখেনি। জাতীয় পর্যায়ে সুযোগ ও সুবিধাভোগী নীতি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে যুলুমে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে স্থায়ী কোনো নৈতিক নীতিমালা আর অবশিষ্ট নেই। ফলে এ শতাব্দী এমন দু'টি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করলো, যাতে নিহত ও আহতের সংখ্যা গোটা মানব ইতিহাসের সমস্ত যুদ্ধের সম্মিলিত নিহত ও আহতদের তুলনায় অনেকগুণ বেশী।

---

১. R. N. Crew-Hunt: Theory and practice of Communism. London 1951, P-6.

(৩) এই ধর্মহীন রাষ্ট্রের চারিত্রিক প্রভাবও ছিল ধ্বংসাত্মক। এর মাধ্যমে দৃঢ়তা, স্বাধীন চিত্ততা, সাহসিকতা এবং বিশেষ করে সততা এবং দুষ্কৃতির মধ্যে পার্থক্য করার প্রাণশক্তি নিঃশেষ হতে থাকে। অপর দিকে স্বার্থপরতা, সুবিধা ভোগ এবং ঝোপ বুঝে কোপ দেয়া নীতি ব্যক্তি ও সামষ্টিক চরিত্রের বুনিয়াদে পরিণত হয়। যার ফলে হাজারো সামাজিক ও সামষ্টিক অপরাধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যা সমাজকে শান্তি স্বস্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে।

(৪) অভিজ্ঞতা বলে, মানুষের লক্ষ্য যখন নিরেট বস্তুগত স্বার্থে পরিণত হয় এবং কোনো উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যবস্থা বর্তমান না থাকে তখন মানুষ নিরেট বস্তুগত স্বার্থ ও লাভ করতে পারেনা। আরনল্ড টয়নবী সমাজতন্ত্রের পরিণাম পর্যালোচনা করে স্পষ্ট ভাষায় তার ব্যর্থতা স্বীকার করেছেনঃ

"একথা এখন দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যদি কেবল পার্থিব সুখ আনন্দকেই জীবন উদ্দেশ্য বানানো হয় তবে তাতে ব্যক্তির বস্তুগত সুখ এবং পার্থিব শান্তি লাভ ও অসম্ভব। অবশ্য একথা জ্ঞেয় যে, যদি সমাজতন্ত্র থেকে উন্নত কোনো আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য হয় তবে একটি আনুষাঙ্গিক পরিণতি হিসাবে মানুষ পার্থিব সুখ এবং আনন্দও লাভ করবে।"[১]

(৫) আরো সত্য কথা হচ্ছে এই যে, সমাজতন্ত্র কেবল বাস্তবেই ব্যর্থ হয়নি, বরঞ্চ ইতিহাস এখন সমাজতন্ত্র থেকে অনেক সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেছে। ভালভাবে খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সমাজতন্ত্র আজ একটা কাহিনীগত ধারনায় পরিণত হয়েছে। সময়ের আবর্তন এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। সমাজতন্ত্র ছিল নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কার্যকারণের ফসল এবং কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিবেশেই তা কাজ করতে পারে। সেসব কার্যকারণের অবর্তমানে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব টিকে থাকা সম্ভব নয়।

আগেই বলেছি, সমাজতন্ত্র হচ্ছে সেই ব্যবস্থার নাম, যার রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের কোনো প্রবেশাধিকার নেই। আরো অধিক বিশ্লেষণ করলে কথা এই দাঁড়ায় যে, সমাজতন্ত্র ধর্ম ও আদর্শ নিরপেক্ষতার দাবীদার। উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে জানা যায়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ,

---

১. Arnold J. Toynbee, Christianity amony the religions of the world, p-56.

জাতীয়তাবাদ এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্নস্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না করাই ছিল সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির বুনিয়াদী ধারণা। আর এ সবগুলো ধারণাই পরস্পর সম্পৃক্ত। সমাজতন্ত্র কেবল তখুনি কামিয়াব হতে পারে, যখন রাষ্ট্র হবে একটি পুলিশি সংস্থা অর্থ্যাৎ তার দায়িত্ব হবে শুধুমাত্র নিয়ম শৃংখলা বজায় রাখা এবং রাষ্ট্রকে বহির্হামলা এবং আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ থেকে রক্ষা করা। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যেই ব্যক্তিকে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে। সেখানে ব্যক্তি যেমন ভাবে চাইবে জীবন যাপন করবে। কেবল এরূপ অবস্থায়ই রাষ্ট্র (অন্তত আদর্শিক সীমার মধ্যে) ধর্মীয় ও আদর্শিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারে। আর উনবিংশ শতাব্দীর ধারনা এটাই ছিল। কিন্ত বর্তমানে রাষ্ট্রের ধারনা পাল্টে গেছে। আজ রাষ্ট্র কেবল একটি বিরাটকায় প্রতিমা নয়। একটি বিশেষ সীমা বাদ দিয়ে দেশে যা কিছু ঘটে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করাটা রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। বর্তমানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি অনেক বিরাট এবং অত্যন্ত ব্যাপক। বর্তমানে রাষ্ট্র জীবনের প্রতিটি বিভাগের রূপরেখা তৈরী করে এবং নিজস্ব পলিসির মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রিত ও শৃংখলিত করে। এখন জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করা এবং নিরক্ষরতা নির্মূল করা রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব। দারিদ্র দূর করা এবং সম্পদের ইনসাফ ভিত্তিক বন্টনের কোশেশ করা তারই দায়িত্ব। সামাজিক যাবতীয় দুষ্কৃতির মূলোৎপাটন করা এবং নাগরিকদের নৈতিক এবং সামাজিক শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা তারই দায়িত্ব। অসুস্থদের চিকিৎসা করা, মযলুমদের ফরিয়াদ শোনা এবং নির্যাতিতদের সাহায্য সহযোগিতা করা তারই দায়িত্ব। মোটকথা, বর্তমান রাষ্ট্র হচ্ছে কল্যাণ ধর্মী রাষ্ট্র। তার জন্যে আদর্শিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাকে তো অবশ্যই কোনো একটা নীতি মেনে চলতে হবে, কোনো না কোনো আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। ভালমন্দ এবং সফলতা ও ব্যর্থতার কোনো না কোনো মানদন্ড অবলম্বন করতে হবে এবং তারই আলোকে নিজের গোটা পলিসিকে সাজাতে হবে। এ কারণেই বর্তমান রাষ্ট্রসমূহ আদর্শিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে যাচ্ছে। আর যেসব ভিত্তির উপর সমাজতন্ত্রের দার্শনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্তমানে ইতিহাসের স্মৃতি হিসাবে তো সেগুলো অবশ্যি মজুদ আছে। কিন্তু বাস্তব দুনিয়ায় সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। যেসব ভিতের উপর এই দূর্গটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলো ধ্বসে পড়ে গেছে। কেবল কামনা বাসনার দ্বারা এই শূন্যতা পূর্ন করা যেতে পারেনা। বর্তমান বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার আর কোনো সুযোগ নেই। ইতিহাস তাকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। বর্তমান বিশ্বে প্রয়োজন আদর্শিক রাষ্ট্রের যা নাকি সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ন বিপরীত এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার আহবায়ক।

৩. ইসলামী বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সংগ্রাম

এই পটভূমিতে আমরা যখন মহা শক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তখন আমাদের কাছে এই ইংগিতই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিমদেশগুলো যখন বহু বছরের গোলামী জীবন থেকে স্বাধীনতা লাভ করছে এবং তাদের মধ্যে প্রায় সবগুলো দেশেই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছে তাতে আধুনিক সভ্যতার পতনের ফলে উদ্ভূত শুন্যতা পূরণের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হচ্ছে। সত্য বলতে কি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সম্রাজ্যবাদ এক এক করে সবগুলো মুসলিমদেশ কব্জা করে নেয়। কেবল দু'তিনটি দেশই এই রাজনৈতিক গোলামীর তিমিরান্ধকার থেকে রক্ষা পায়। বিংশ–শতাব্দীতে এসে অবস্থার মোড় পরিবর্তন হয়ে যায়। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম দেশ গুলোর স্বাধীনতা লাভের সূচনা দেখা দেয়। বর্তমানে চৌত্রিশটি[১] স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে। এরাষ্ট্রগুলো নিজেদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ভবিষ্যত নির্মানের জন্যে নিজেরাই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ন সমস্যাও দেখা দিয়েছে। মুসলমানরা যতোদিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোলাম ছিল ততোদিন ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে নিজেদের সামাজিক জীবনকে ঢেলে সাজানো সম্ভব ছিলনা। তাদের দীন জীবনের একটি পূর্নাংগ নীতিমালা তাদের দিয়েছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সবগুলো বিভাগে আল্লাহ্ এবং রাসূলের শিক্ষাকে কার্যকর না করা পর্যন্ত তারা ঈমানের দাবী পূর্ন করতে পারেনা। স্বাধীনতা লাভের পর স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সামষ্টিক জীবন ব্যবস্থাকে বিশেষ করে রাষ্ট্র, আইন ও শাসনতন্ত্রকে ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ঢেলে সাজানো হবে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জনগনের যে দাবী তার পিছনে এই অনুভূতিই তীব্রভাবে কাজ করছে।

ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে এ আন্দোলন এক দুঃসাহসিক আন্দোলন। আর এর সাথেই সম্পৃক্ত রয়েছে ভবিষ্যতের সমস্ত কল্যাণ। কিন্তু আরো একটি ভাববার বিষয় রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, একটি মুসলিম দেশে কেন ইসলামী

---

১ এই নিবন্ধটি এখন থেকে প্রায় ২৪ বছর আগে লেখা হয়েছিল। এরি মধ্যে আরো বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীন হয়েছে। বর্তমানে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশটি। –অনুবাদক

রাষ্ট্র দাবী করার প্রয়োজন পড়ল? তাতো স্বাভাবিক ভাবেই ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া উচিত ছিল, এবং তার সমস্ত শক্তি এই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হওয়া উচিত ছিল, যেন সবকিছু ইসলামের মাপকাঠির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রকৃত অবস্থা তা নয়। এর মূল কারণ হচ্ছে এই যে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছিল তা মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণীকে ইসলাম থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক বলতে গেলে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানেইনা। তাদের মধ্যে একটা শ্রেণী এরকমও আছে যাদের মনমগজকে এতোটা বিষাক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, তারা ইসলাম সম্পর্কে চরম ভ্রান্ত ধারনার শিকার। ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে রয়েছে তাদের কুধারণা। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের এরা দেখে পাশ্চাত্যের সৃষ্ট চশমা দিয়ে। এই শ্রেণীটি বর্তমান যুগে ইসলামকে প্রাচীন কাহিনী বলে মনে করে। অপর দিকে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণ তাদের দীন ও ঈমানে পরিণত হয়েছে। এই শ্রেণীটি স্বয়ং তাদের দেশবাসীর আবেগ ও অনুভূতির বিরুদ্ধে চরম যুদ্ধ ও সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে।

একদিকে রয়েছে চরম গাফলতি ও অজ্ঞতা অপরদিকে রয়েছে ভ্রান্ত ধারনা ও শত্রুতা। এই জিনিসগুলো ইসলামী রাষ্ট্র বিকাশের পথে সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধকতা। আমাদের দৃষ্টিতে এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করার পন্থা হচ্ছে এই যে, একদিকে ইসলামী শিক্ষাকে অধিক ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সাধারণ জনগণকে মানসিক ও চিন্তাগত প্রশিক্ষণ দিয়ে যেতে হবে। অপরদিকে জীবনের সকল বিভাগে এমন এক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিতে হবে যা মুসলমানদের পরম সাধ ও আকাঙ্খার জজবা ও আবেগকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, ইসলামের প্রতি রাখবে পাকা ইয়াকীন এবং জীবনের প্রতিটি বিভাগে তাকে চালু ও কার্যকর করার জন্যে রাখবে প্রবল আকাঙ্খা। কেবল এই পন্থায়ই জাতির সকল যোগ্যতা ও শক্তি পারস্পরিক দ্বন্দ ও সংঘাতের পরিবর্তে সুদৃঢ় পূনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত হতে পারে এবং এভাবেই অতিক্রম করা সম্ভব বহু বছরের মনযিল কয়েক মাসে।

সমাপ্ত